মাটির উপর চা গাছ

শুধু ধান নয়, সব খাদ্যের জন্যই মাটি দরকার। তাই কি? মাছ, মাংস, ডিম তৈরি করতেও? হ্যাঁ, দরকার। কারণ, মাটি ছাড়া গাছ হবে না। গাছ অথবা শস্য খেলে তবেই তো প্রাণীদের মাংস হবে! পুকুরও তো মাটির উপরেই। তাই, মাটি ছাড়া মাছও হবে না। সকালবেলার চা থেকে সব খাবার পেতেই মাটি চাই।

রাবেয়ারা অবশ্য মাটির উপর চা-গাছ দেখেনি। শুধু শুনেছে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে চা হয়। সেও কি আসলে মাটিতে?

স্যার বললেন--- মাটিতে তো বটেই। দার্জিলিং-এর পাহাড়েও মাটি থাকে। তার উপরেই চা-গাছ হয়।

অজিত বলল— পাহাড়ে ধান, শাক-সবজি হয় না?

— হয়, সবেরই চাষ হয়। উঁচু তো। মে-জুন মাসেও ঠান্ডা। কপি হয়। পাহাড়ের ঢালে চাষের ছোটো ছোটো জমি তৈরি করে নেওয়া হয়। অনেকটা সিঁড়ির মতো। সেখানে জল আটকে ধান চাষও হয়।

ওরা এত জানত না। শ্যামল বলল - পাহাড়ে এত মাটি আছে?

—ধান বা শাক-সবজি চাষে মোটে এক-দেড় ফুট গভীর মাটি লাগে।

— বড়ো গাছ হয় না?

—বড়ো গাছও হয়। বড়ো গাছের শিকড় পাথরের ফাঁকে মাটিতে ঢুকে যায়। কখনও পাথর ফাটিয়েও ঢুকে যায়।

— পাথরের ভিতরে মাটি আসে কোথা থেকে?

—ভূমিকম্পে, সূর্যের তাপে, প্রবল বৃষ্টিতে পাথর ফেটে গুঁড়ো হয়। অনেক বছর ধরে অনেক কিছুর সঙ্গে তা মিশে মাটি হয়। মস, ফার্নরাও মাটি তৈরিতে সাহায্য করে। এভাবে মাটি তৈরি হতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। সেই মাটির কিছুটা

পাথরের ফাটল দিয়ে ভিতরে চলে যায়। আবার কিছুটা বৃষ্টিতে ধুয়ে সমতলে এসে থিতোয়। তবে মনে রেখো পাহাড়, সমতল সর্বত্রই খাদ্য তৈরি করতে মাটি চাই।

বলাবলি করে লেখো

টবে বা মাটিতে ফুল বা শাক-সবজি চাষ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করে লেখো:

কীসের চাষ	চাষ করতে কতটা গভীর মাটি লাগে	কেমন ধরনের মাটি লাগে	কীভাবে সেই মাটি চাষের যোগ্য করা হয়

ধসে রাস্তা বন্ধ

রেডিয়োর খবরে দীপেন ধসের কথা শুনল। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির পথে ধস নেমেছে। সব গাড়ি ঘুরপথে যাচ্ছে। স্কুলে এসে সে অন্যদের বলল সেকথা। ধস কী? কীভাবে হয়? শেষে স্যারকে জিজ্ঞাসা করল।

স্যার বললেন — মাটি ধসে পড়া দেখোনি?

— পুকুর পাড়ের মাটি মাঝে মাঝে ধসে পড়ে।

—পুকুরের পাড় খাড়া। সেইরকম খাড়া পাহাড়ের রাস্তার ধার। উপরে দেখবে একটা বড়ো পাথর। হয়তো তার তলায় মাটি। উপরের পাথরটা অনেক দিন ধরে একটু একটু করে সরছে। খুব বৃষ্টিতে তলার মাটিটা গলে গেল। পাথরটা পড়ে গেল। পড়ার সময় আরও কিছু গাছ-পাথর নিয়ে পড়ল। ভূমিকম্প হলেও পাহাড়ে ধস নামে।

রানু বলল—বড়ো গাছ থাকলে সহজে এমন হয় না। ঘাসের চাপড়া থাকলেও ধসে না।

সুবীর বলল— কী করে জানলি ? তুই পাহাড়ে গিয়ে দেখেছিস ?

— তা নয়। পুকুরের কথা বলছি। আমাদের পুকুরের পাড়ে একটা জামগাছ আছে। ঝড়বৃষ্টির পর পাশের মাটি ধসে পড়ে। কিন্তু, গাছটার গোড়ার কাছের মাটি ধসে না।

—এই তো বেশ দেখেছ। সব জায়গায় এমন পাড় ভাঙে। এভাবে মাটি সরে যাওয়াকে বলে ভূমিক্ষয়।

সাবিনা হেসে বলল - বুঝেছি। ভূমি তো মাটি। ক্ষয় হওয়া মানে নষ্ট হওয়া।

— কীভাবে ভূমিক্ষয় বাড়ে ভেবে দেখো। ধরো, একটা পলিথিন। তার উপরে মাটির যে কণা আছে তার সঙ্গে নীচের কণার ছোঁয়া থাকে না। ফলে জোর বৃষ্টি বা ঝড় হলে উপরের মাটি সরে যায়।

মিনতি বলল— সেইজন্যই বলে, পাহাড়ে পলিথিন, প্লাস্টিকের কাপ, ওষুধের মোড়ক এসব ফেলা যাবে না।

দীপেন বলল— আর গাছ কাটা যাবে না। মাটি ধরে রাখে এমন গাছ লাগাতে হবে। তাহলেই ধস কমবে।

বলাবলি করে লেখো

ভূমিক্ষয় ও তার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

কী কী ভাবে ভূমিক্ষয় হয়	ভূমিক্ষয়ের ফলে কী কী অসুবিধা হয়	কী কী করলে ভূমিক্ষয় কমবে

চেনা চেনা জলাশয়

নাম তার মোতিবিল বহুদূর জল
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে
মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে।

সহজ পাঠ প্রথমভাগ পড়ার সময় থেকেই কালাম মোতিবিলটা খুঁজছে। বাড়ির পাশের পুকুরেই হাঁসের দল ঘোরে। মাঝে মধ্যেই মাছরাঙা ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে যায়।

পাড়া ছেড়ে একটু গেলেই চখাচখির বিল। সেখানে বক পাঁকের মধ্যে মাছ খোঁজে। একদিন একটা চিল সাঁ করে এল। জল ছুঁয়ে নখে করে মাছ নিল। উড়ে গেল।

বিলের পাশ দিয়ে রাস্তা। তার ওপাশে একটানা নয়ানজুলি। ওটাও জলাশয়। মাছ আছে ওখানেও। নয়ানজুলিতে লোকেরা মাঝেমধ্যে মাছ ধরে। নিজেরা খায়, বিক্রি করে।

কালাম স্কুলে এসব বলায় দিলীপ বলল--- গাঁয়ের শান-বাঁধানো পুকুরটার কথাই ভুলে গেলি! আর দক্ষিণপাড়ার মাছের ভেড়িগুলো?

স্যার বললেন— শুধু ওটা কেন? আরও জলাশয় আছে। তবে আজকাল অনেক পুকুরের চারপাশ পাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে

কচ্ছপ, ব্যাঙের মতো অনেক জীবের বিপদ হতে পারে। বাড়ি থেকে স্কুলের পথের পাশের সবকটা জলাশয়ের মানচিত্র আঁকতে পারবে?

তিয়ান বলল— বোর্ডে আঁকব?

—আঁকবে। আগে বলত ঘরবাড়ি কীভাবে দেখাবে?

তিয়ান বলল— ওসব দেখাব না। জলাশয়-মানচিত্র তো!

কালাম বলল— তোদের তো দুটো রাস্তা। একটা রাস্তার পাশে বাঁওড় আছে। সেটা কীভাবে দেখাবি?

হাসি বলল— বাঁওড় কী?

রেবা বলল— নদীর বাঁকে খানিকটা জায়গা নদী থেকে আলাদা হয়ে বদ্ধজলা হয়ে যায়। তাকে বলে বাঁওড়।

আকাশ বলল— স্যার, পাহাড়ি অঞ্চলে ঝরনা আছে।

—তুমি আগে পাহাড়ি অঞ্চলে থাকতে, তাই না? পাহাড়ে অনেক ছোটো ছোটো ঝরনা আছে। তাদের বলে ঝোরা।

— সেখানকার জলাশয়-মানচিত্র আঁকব?

— নিশ্চয়ই আঁকবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার দেখা সবচেয়ে বড়ো জলাশয়ের কথা লেখো:

জলাশয়টার নাম ও ঠিকানা	সেখানে কী কী আছে	কী কী পশুপাখি সেখানে আসে	সেটা মানুষের কী কী কাজে লাগে

নতুন করে চিনছি আবার চেনা পুকুর-বিল

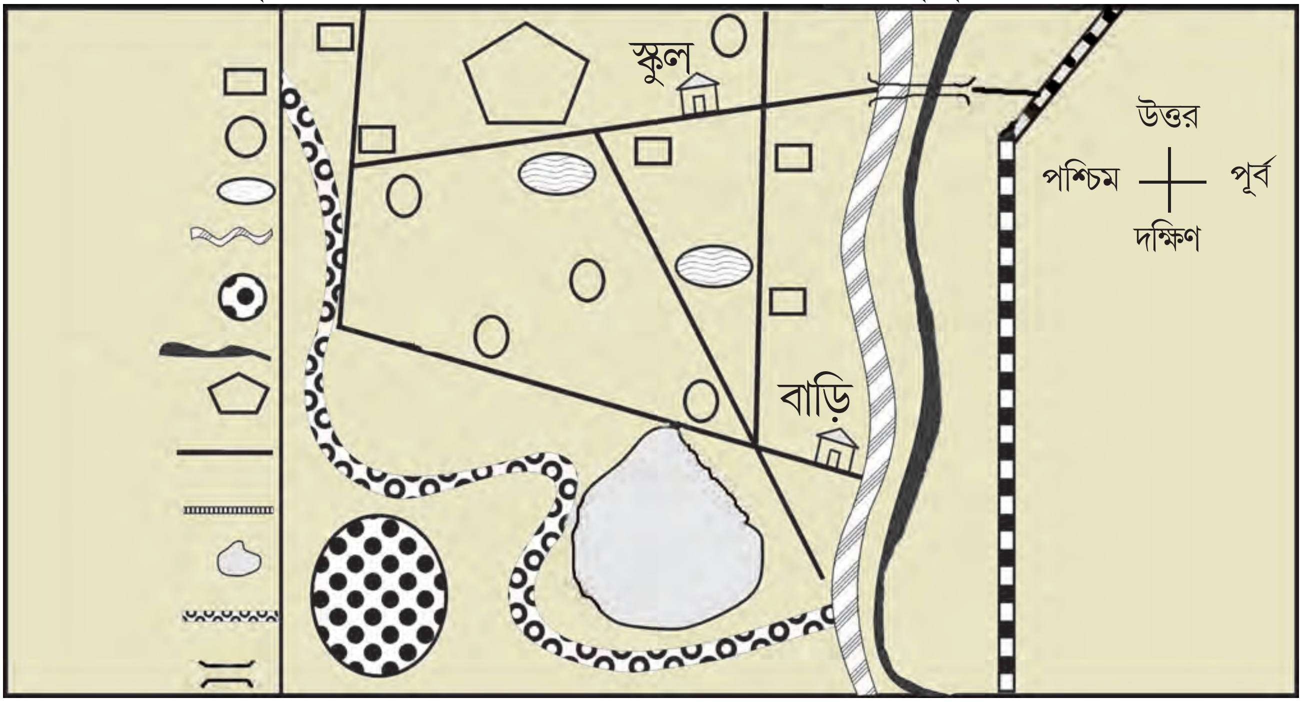

তিয়ানের জলাশয়-মানচিত্র আঁকা হয়ে গেল। মানচিত্রে সব জলাশয় রয়েছে। সাবির গুনল। শান-বাঁধানো পুকুর দুটো। সাধারণ পুকুর পাঁচটা। ডোবাও পাঁচটা।

তারপর একটা ছবি আঁকল। বলল— যেভাবে টিভিতে ক্রিকেট খেলায় ওভার প্রতি রান দেখায়, সেভাবে পুকুরের সংখ্যা দেখালাম।

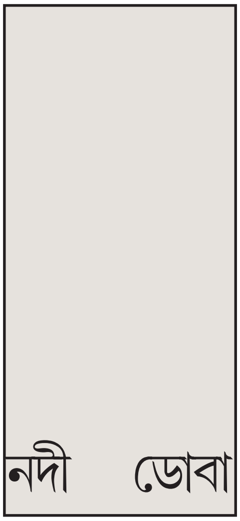

স্যার বললেন--- নদী আর নয়ানজুলি কটা করে দেখছ?

— একটা করেই।

— রাস্তাটা কি তিয়ান ঠিকঠাক দেখিয়েছে?

সুবোধ বলল— হ্যাঁ, স্যার। আমরা একসঙ্গে আসি। বর্ষাকালে ঘুরপথেই আসতে হয়। তখন আসতে প্রায় আধ-ঘন্টা লাগে। আর শীতে বা গরমে নদীর পাশ দিয়ে আসি। তখন মিনিট পনেরো লাগে।

— বেশ। তাহলে দূরত্বটা তিয়ান আন্দাজ করেছে ভালো। আর দিকটা?

— তাও ঠিক দেখিয়েছে। স্কুল থেকে ওদের বাড়িটা দক্ষিণেই পড়ে।

— তাহলে এটা স্কুলের কোন পাশের জলাশয় মানচিত্র?

তৃপ্তি বলল - দক্ষিণ-পশ্চিম। বাড়িটা দক্ষিণে। তবে পশ্চিমও দেখিয়েছে।

স্যার বললেন —ঠিক বলেছ। আচ্ছা, সাবির দু-রকম পুকুরের সংখ্যা দেখাল। ওইভাবে নদী আর ডোবা দেখাও।

সাবির বলল - স্যার, একটা ছবিতে সবই দেখানো যাবে। দু-রকম পুকুর, বিল, বাঁওড়, ভেড়ি, নদী – সব কিছুর সংখ্যাই।

— বেশ তাই দেখাও।

তুমি যেখানে থাকো সেখানে নদী আর ডোবা ক-টা করে আছে তা উপরে ডান পাশের খোপে দেখাও। সব কিছু ক-টা করে আছে তা নীচে দেখাও:

ভেড়ি	বিল	ডোবা	নদী	শান-বাঁধানো পুকুর	সাধারণ পুকুর	বাঁওড়	নয়ান জুলি

নতুন জলাশয়

সাবিনাদের বাড়িটা স্কুল থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে। এদিকটায় বিল-ভেড়ি কিছুই নেই। একটু শহরের দিক তো ! নদীটাও উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। শুধু বাড়ি আর পাঁচটা পুকুর। তার দুটো ঘাট শান-বাঁধানো।

সাবিনা রাস্তার পাশের জলের কলগুলো দেখতে লাগল। আট জায়গায় কল। তার মধ্যে তিনটে ভাঙা। জল পড়েই যাচ্ছে। দুটো কলে কেউ জল নিতে আসেনি।

পরদিন সবাই নিজের আঁকা মানচিত্র দেখাল। অন্তরাদের বাড়ি স্কুলের উত্তর-পশ্চিমে। তার মানচিত্রে অনেক ছোটো ডোবা রয়েছে। শিবা দেখিয়েছে দক্ষিণ-পূর্বটা। ওদিকে চারটে শান-বাঁধানো পুকুর। তিয়ান এঁকেছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের মানচিত্র। অন্যরাও এঁকেছে। সাবিনা একাই এঁকেছে উত্তর-পূর্ব দিকের মানচিত্র। আসলে ওদিকের বেশি ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ে না। স্যার চারদিকের চারটে মানচিত্র নিয়ে বোর্ডে লাগিয়ে দিলেন।

বললেন— এই হলো স্কুলের চারপাশের জলাশয়-মানচিত্র। এটা ভালো করে দেখে নাও। কোথায় কোন জলাশয় আছে। তারপর নিজেরা আঁকবে।

অন্তরা বলল—স্যার, জলের কলটা কি জলাশয়?

স্যার হেসে বললেন— আমিও তাই ভাবছি! জলাশয় না হোক জলের উৎস তো বটে। একটা জলের কল থেকে রোজ কতটা জল পড়ে? তুমি যে ডোবা দেখিয়েছ তার সবচেয়ে ছোটোটা ভরতি হবে? একটু থেমে আবার বললেন,

— অনেকেই শহরে থাকে। তারা তো দু-একটা পুকুর ছাড়া জলাশয় দেখাতে পারবে না। সাবিনা ভালোই করেছে। শহরের জলের ট্যাঙ্ক, রাস্তার পাশের জলের কল আর পুকুর দেখিয়েছে। তার চিহ্ন ঠিক করেছে।

অন্তরা বলল— একটা কল থেকে একদিনে অনেক জল পড়ে। কতটা জল পড়ে তা কি হিসেব করা যায়?

— নিশ্চয়ই করা যায়। ভাবতে থাকো। কীভাবে করা যাবে!

তোমার স্কুলের চারপাশের জলাশয়-মানচিত্র নীচে আঁকো। আর একটা বড়ো কাগজেও আঁকো :

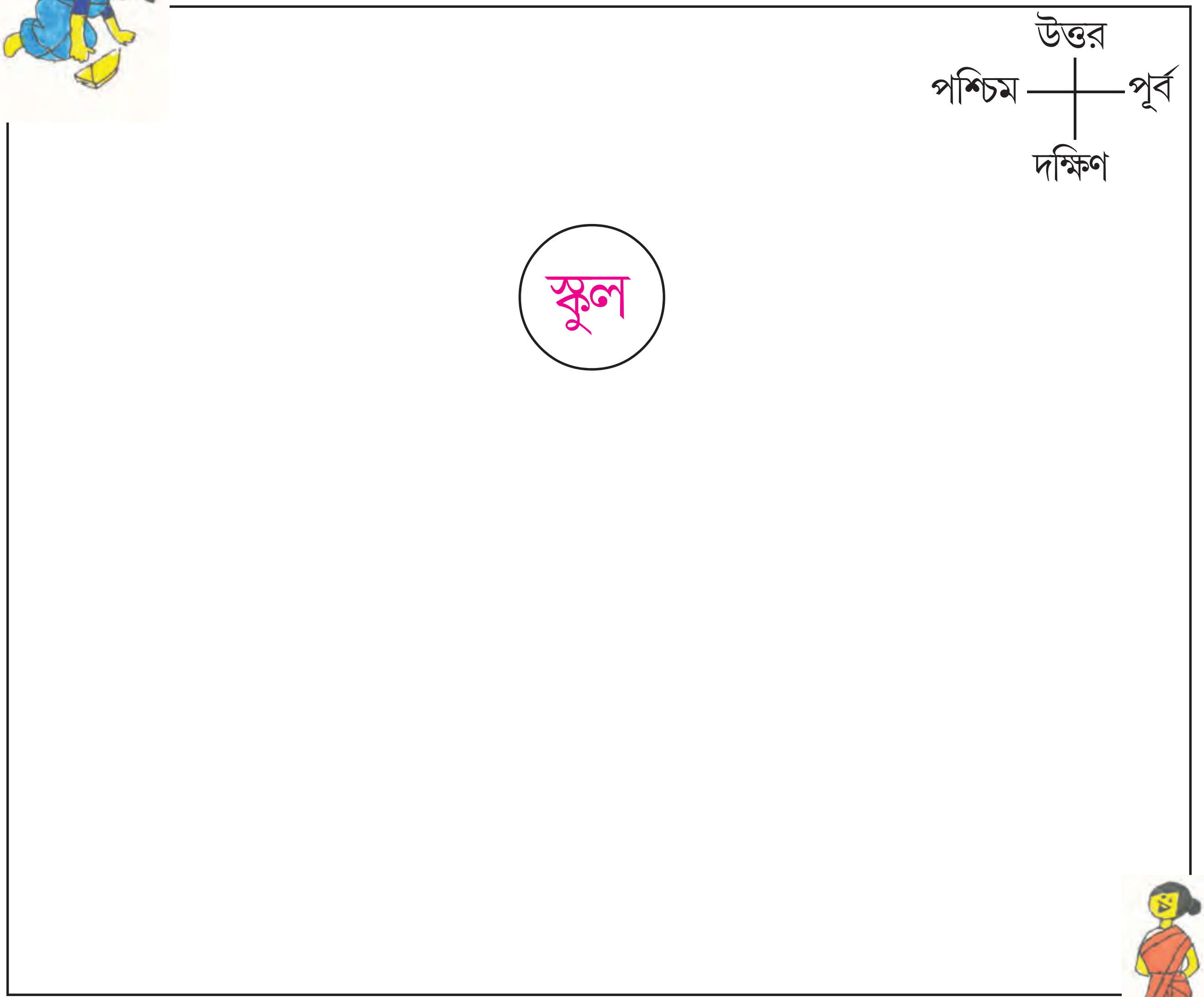

স্রোতের জল, স্থির জল

ফেরার পথে আকাশ বলল - পাহাড়ের বেশিরভাগ জলাশয়ে খুব স্রোত।

অন্তরা বলল— উঁচু-নীচু তো। যেখানেই নীচু পাবে জল সেদিকে হুহু করে যাবে।

রফিকুল বলল — বর্ষাকালে এখানেও মাঠের পাশে নালায় স্রোত হয়। নয়ানজুলিতেও স্রোত দেখা যায় । কোনদিক থেকে কোনদিকে জল যায় দেখেছিস ? দেখলেই এখানকার জমি কোথায় উঁচু কোথায় নীচু বোঝা যাবে।

— নীচু জায়গাগুলোয় বৃষ্টির জল জমে। জলাশয় হয়ে যায়।

সাবিনা বলল - বাড়িতে ব্যবহার করা জলও পুকুরে পড়ে।

— তোদের ওদিকে পড়ে। চারপাশে পাকা ড্রেন। মাঝখানে পুকুর। তাই ড্রেনের জল আসে। গরমেও জল শুকোয় না।

রফিক্‌ুল বলল— ড্রেনের নোংরা জল পুকুরে জমে?

সাবিনা বলল— তবে জলটা তত নোংরা হয় না।

কিন্তু কেন হয় না?

স্যার বললেন — বাতাস বয়। বাতাসের অক্সিজেন জলে গুলে যায়। জলে-পড়া নোংরার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। সেগুলো ভেঙে দেয়।

— স্যার, রাসায়নিক বিক্রিয়া কী?

— দুধে লেবুর রস দিলে কী হয়? কাপড়ের দাগে লেবুর রস দিয়ে দেখেছ?

কমলা বলল - দুধ কেটে ছানা হয়ে যায়। ছানা আর ছানার জল আলাদা হয়ে যায়। ছানা আর দুধ হয় না।

তিতলি বলল— জামায় দাগ উঠছিল না। লেবুর রস দিতে উঠে গেল।

— এগুলোই রাসায়নিক বিক্রিয়া।

বলাবলি করে লেখো

আর কোথায় রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া দেখেছ? এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো। তারপর লেখো:

কোথায় রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া দেখেছ	তার ফলে রং বদলে যাওয়া বা বিক্রিয়ায় কী তৈরি হয়েছে বা অন্য কী ঘটেছে
চকচকে লোহার পেরেক বাতাসে ফেলে রাখলে	
কয়লা পোড়ানো হলো	
আলু কেটে ফেলে রাখা হলো	

জলশোধনের নানাকথা

কমলা বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। তবুও ভাবছে। জলের সব নোংরার সঙ্গে কি বাতাসের অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে? তাহলে পুকুরে গোরু স্নান করালে ক্ষতি কি? যে যা খুশি ফেলুক না! কিন্তু তাহলে কেন ওরকম বোর্ড লাগিয়েছে পুকুরের গায়ে? নাকি বুঝতে ভুল হলো!

সতর্কীকরণ
পুকুরে গবাদি পশু স্নান করানো, মল-মূত্র পরিত্যাগ করা, বাড়ির আবর্জনা, পলিথিন ইত্যাদি ফেলা ও বাসন মাজা নিষিদ্ধ।

পরের দিন। কমলা ওর ভাবনার কথা বলল। স্যার বললেন—

সব কিছুর সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন কী করে বিক্রিয়া করবে? প্রাকৃতিক জল শোধনে আরও অনেকের সাহায্য আছে। শুধু বাতাসের অক্সিজেন নয়।

জবা বলল— অনেক কিছু মাছে খেয়ে ফেলে।

— ঠিক বলেছ। আরও অনেক ছোটো-বড়ো জীব আছে। তারা কিছু নোংরা খায়। অন্যভাবেও জলে অক্সিজেন তৈরি হয়।

এই অক্সিজেন আর বাতাসের অক্সিজেন মিলে কিছু নোংরা শোধন করে।

স্বপ্নার বাবা মাছ চাষ করেন। স্বপ্না বলল— মাছের ঘা সারাতে বাবা জলে একটা ওষুধ দেন। বাবা বলে ওতে জলও শোধন হয়।

— ওটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। দূষিত জিনিস তাড়াতাড়ি ভেঙে জলশোধন করে।

কমলা বলল— তবু কেন পুকুরে গোরুকে স্নান করানো বারণ? গোরুর থেকে নানারকম রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে বলে?

— সে তো বটেই। তাছাড়া বেশি রাসায়নিক পদার্থ দিলে অন্য ক্ষতি হবে। নোংরা ফেলা যতটা সম্ভব কমাতে হবে। তাতেও যেটুকু নোংরা হবে দুই পদ্ধতিতে শোধন করতে হবে।

স্বপ্না বলল - দুই পদ্ধতি মানে?

— একটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি। আর একটা জলে রাসায়নিক দেওয়া। তোমার বাবা যা করেন। তবে আবার বলছি। ওইসব রাসায়নিক মেপে দিতে হয়। না হলে মাছ বা অন্য জীব মরে যাবে।

ভৌত পরিবেশ

সাবিনা বলল — পুকুর না থাকলে আমাদের পাড়াটা তো নোংরা গন্ধে ভরে যেত!

— ঠিক তাই। আমরা নোংরা ফেলি, জলাশয় তার কিছুটা পরিষ্কার করে।

বলাবলি করে লেখো

জলাশয় নোংরা হওয়া ও তার শোধন করা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো:

জলাশয়ে কী কী নোংরা মেশে	তার ফলে কী কী সমস্যা হয়	কী কী ভাবে জলাশয়ের জলশোধন হয়
১. কল-কারখানার বর্জ্য		
২. মরা জীব-জন্তুর দেহ		
৩. তরকারির খোসা		
৪. রাসায়নিক সার		
৫. পোকামারার বিষ		
৬. কাপড় কাচা সাবান		

ঘরের বাহিরে তাকিয়ে দেখা

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

শান-পুকুরের ঘাট।

সুবোধ আগেও এসে বসেছে। কিন্তু এমন করে পুকুরটা দেখেনি। ঘাটটাপূর্বদিকে। পাড়গুলো উঁচু করে বাঁধানো। সুবোধ এবার পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল। চারপাশ ঘুরে আসতে কত-পা হয়। গুনে নেবে।

একটু এগিয়ে সুবোধ দেখল, পাড়ের পাশে কত রকম ঘাস, ঝোপ, ফুল। জলের মধ্যেও গাছ! শালুক ফুল, ছোটো ছোটো পানা। জলের খুব কাছে লতার মতো গাছ। খাঁজকাটা পাতা। ঠাকুমা মাঝে মাঝে এইরকম আনে। বলে ঢেঁকি শাক।

সুবোধ কখনও পাড়ের গাছপালা দেখতে দাঁড়াচ্ছে। তখনই

লিখে রাখছে কত পা হল। পাড়ে তালগাছ। খানিক যাওয়ার পর বাঁশঝাড়। কোথাও পাড় ভেঙে জল ঢোকার নালা হয়েছে। মাঠ থেকে বর্ষায় জল ঢোকে। আর একটু এগিয়ে কলার ঝাড়। একটায় কাঁদি ধরেছে। একটায় মোচা বেরিয়েছে। তারপর নিলুদার ঘর। নিলুদা পুকুরের মাছ, পাড়ের গাছপালা আর পাশের আম-কাঁঠালের বাগান পাহারা দেয়। সুবোধ আবার পা গুনে গুনে হাঁটতে শুরু করল।

পরদিন স্কুলে এসে সুবোধ বলল—স্যার, আমরা কোনোদিন কোনো জলাশয়ের মানচিত্র করিনি।

—সেটা করার জন্য আগে একটা জলাশয় খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

এবার সুবোধ ১৫৭০ পা হেঁটে শান-পুকুর ঘোরার কথা বলল।

স্যার বললেন— তোমার এক-পা মানে কতটা?

—আমার দশ-পা মানে তিন মিটার। আগেই দেখে নিয়েছি।

— ঘাটটা কোন দিকে দেখেছ? পুকুরের আকৃতিটা?

— ঘাটটা পূর্বদিকে। পুকুরটা দেখতে গোল মতন।

— তাহলে যা যা আছে তার চিহ্ন ঠিক করো। আঁকো আর বলে বলে দাও। সবাই শুনুক। **এর পর সবাই একটা করে জলাশয় ভালো করে দেখবে। আর তার মানচিত্র আঁকবে।**

সুবোধ দিকচিহ্ন দিয়ে আঁকা শুরু করল। কোনটা কীসের চিহ্ন তা বলে বলে আঁকতে লাগল। একটু পরে শান-পুকুরের মানচিত্র আঁকা হয়ে গেল।

কোনটা কীসের চিহ্ন

- কলাগাছ
- বাঁশঝাড়
- তালগাছ
- ফুলগাছ
- কাশ ফুল
- বাড়ি
- ছোটো পানা
- পথ
- শালুক
- ঘাট

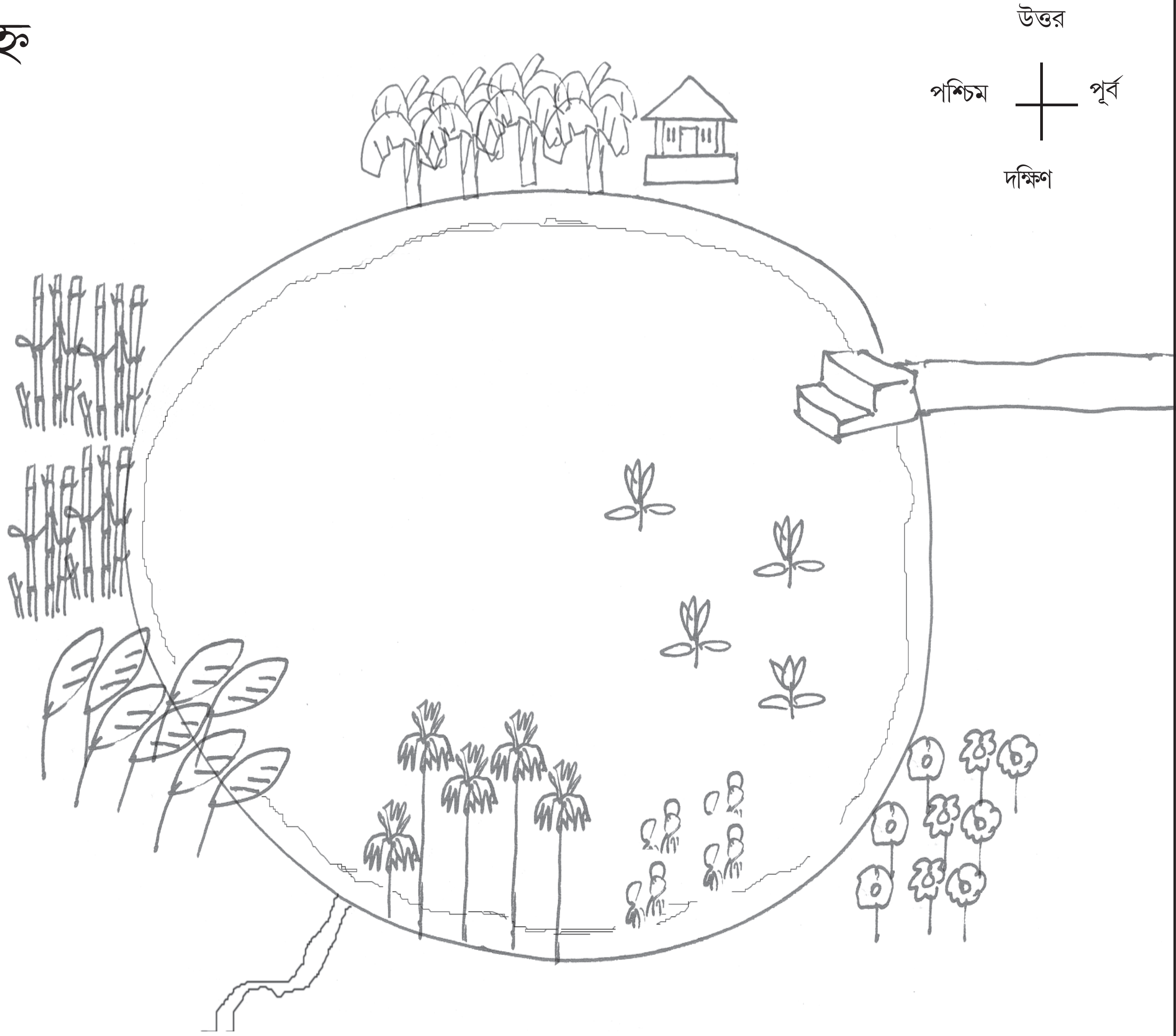

নিজের এলাকায় তোমার পছন্দমতো একটা পুকুর বা অন্য কোনো জলাশয়ের মানচিত্র আঁকো:

উত্তর

পশ্চিম — পূর্ব

দক্ষিণ

মাটির নীচের জল

পরদিনের ক্লাস। জবা বলল - আমাদের গাঁয়ে আরও বড়ো পুকুর আছে।

---সেই পুকুরেও কী জল ঢোকার অনেক নালা আছে?

— সেটার পাড় বেশি উঁচু নয়। বর্ষায় চারদিক থেকেই জল আসে।

— তাহলে ওটা পানীয় জলের পুকুর ছিল না। সুবোধ যে পুকুর দেখিয়েছিল তার পাড় উঁচু। পানীয় জলের জন্যই কাটা। পরে টিউবওয়েল চালু হয়েছে।

বীরু বলল— আগে টিউবওয়েল ছিল না?

— না, তখন কিছু পুকুর আলাদা করা থাকত। কেউ সেখানে স্নান করত না, নোংরা ফেলত না। এখনও দু-একটা এমন জায়গা আছে। সেখানে মাটির নীচে সহজে জল পাওয়া যায় না। অথবা মাটির নীচের জল খুব নোনতা।

রতন বলল— জানি, সুন্দরবনে। সাগরের কাছে তো।

মাটির নীচে সাগরের জল চুঁইয়ে আসে। তাই জল নোনতা। খালেদা বলল— এখানে মাটির নীচের জল কীভাবে এসেছে?

— হয়তো অনেক আগে থেকেই কিছুটা জল মাটির নীচে ছিল। তার সঙ্গে কিছুটা সাগরের জল চুঁইয়ে এসেছে। লক্ষ- লক্ষ বছর ধরে এসেছে। একটু একটু করে, বালির ভিতর দিয়ে। কোথাও ছোটো কণার বালি। প্রায় কাদার কণার মতো। তাই নুন বেশি আসতে পারেনি।

— আর বাকিটা কীভাবে এসেছে?

— বলা কঠিন। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে থাকতে পারে।

— নীচের জল তুললে বৃষ্টির জল আবার ঢুকে যাবে?

—সেটা সহজে হবে না। এসব হতে বহু বছর লাগে। অনেক নীচের স্তরে বৃষ্টির জল খুব সহজে যাবে না।

— তাহলে তো টিউবওয়েলে পরে আর পানীয় জল উঠবে না!

তিতলি বলল — মিনি ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে লোকে নিজের খুশি মতো চাষের জল তুলছে!

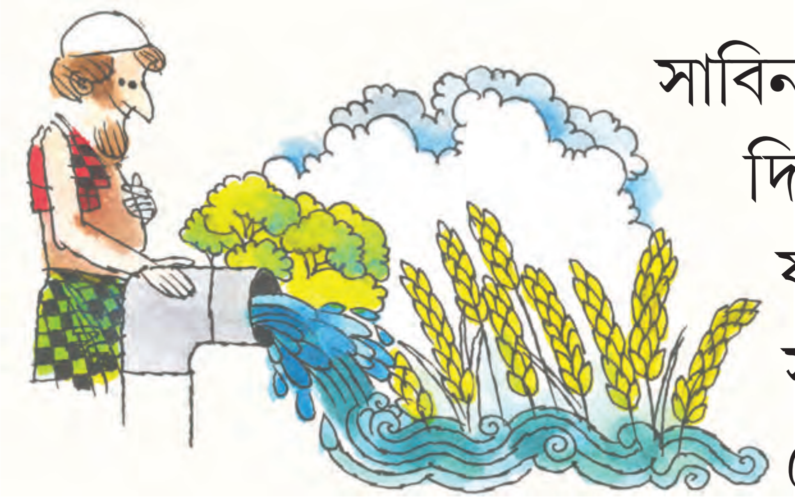

সাবিনা বলল — খোলা কল দিয়ে তো জল পড়েই যাচ্ছে!

সুবোধ বলল — অনেক লোকালয়ে সব কাজেই মাটির নীচের জল ব্যবহার হয়। আবার গ্রামে মাটির নীচের জল তুলে ধান চাষ হয়। এভাবে মাটির নীচের জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। তার ফলে পানীয় জল দূষিত হচ্ছে।

বলাবলি করে লেখো

কী কী কাজে মাটির নীচের জল ব্যবহার করলে ভালো হয়? এ নিয়ে নিজেরা আলোচনা করো। তারপর লেখো :

কী কী কাজে নীচের জল ব্যবহার হয়	অন্য কোন কাজে কোথাকার জল ব্যবহার করা যায়	কোন কোন কাজে মাটির নীচের জল ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই

জল নষ্ট আর জলকষ্ট

সাবিনা ফেরার পথে আবার সেই দৃশ্য দেখল। একটা জলের কল খোলা রয়েছে। কেউ জল নিতে আসেনি। সাবিনা কলটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে পাড়ায় ঢুকল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা খোলা পাইপ দিয়ে জল পড়েই যাচ্ছে। ভালো করে দেখল। দেখে বুঝল, যে ট্যাঙ্কে এসে জল জমে, এটা সেই ট্যাঙ্ক।

পরদিন স্কুলে ও এসে এসব কথা বলল। শুনে কেয়া বলল, — আমাদের পাড়ায়ও জল নষ্ট হয়। সজলধারার জল এসেছে গত বছর। পাড়ায় ঢোকার মুখে একটা কল। দশদিনের মধ্যে কেউ ভেঙে ফেলেছে। এখন জল আসলে একটানা জল পড়ে। সকালে আমরা লম্বা লাইন দিয়ে জল ভরি। দুপুরে দু-একজন করে আসে। জল নেয়। স্নান করে। বাকি জলটা পড়ে নষ্ট হয়।

অনন্ত বলল—এক-দুই বালতি করে জল নিলে হয়? সারাদিন চলে?

— আমরা ওই জলটা খাই। অন্য সব কাজ পুকুরের জলে হয়।

— রান্না? চাল ধোয়া, আনাজপাতি ধোয়া?

—পুকুরের জলেই ওসব হয়। তবে সম্ভব হলে সেগুলো আবার কলের জলে ধোয়া ভালো।

জবা বলল— কেন? অত জল নষ্ট হয়। সেটা নিতে পারিস!

কেয়া বলল— অত দূর থেকে বেশি জল আনা মুশকিল।

স্যার শুনছিলেন। এবার বললেন— রান্নায় জল অনেকক্ষণ ফোটে। তবুও রান্নাটা পুকুরের জলে না করাই ভালো।

অনন্ত বলল— শশা কেটে খাবি। ওটা তো আর জলে ফোটাবি না। চিড়ে ভিজিয়ে খাবি। সেটাও জলে ফুটবে না। এসব কাজে একদম পুকুরের জল ব্যবহার করিস না।

বলাবলি করে লেখো

বাড়িতে কী কাজে কোন উৎসের জল ব্যবহার করা উচিত? ভালো করে ভেবে, আলোচনা করে লেখো:

পানের জল		মুখ ধোয়া	
চাল ও আনাজ ধোয়া		বাসন ধোয়া	
কাঁচা খাবার, ফল ধোয়া		কাপড় কাচা	
মুড়ি-চিঁড়ে ভেজানো		ঘর মোছা	
রান্না করা		স্নান করা	

জল হলো নষ্ট, টিউবওয়েলের কষ্ট

অন্তরা আর সুজন যাচ্ছিল। ওরা দেখল অচেনা দুজন ছেলেমেয়ে টিউবওয়েল পাম্প করে জল খাচ্ছে। ওদেরই সমবয়সি। ভাবল, ওরা কতটা জল খাচ্ছে, আর কতটা

ফেলছে? মাপা যাবে? অন্তরা গুনল, মেয়েটা দশবার পাম্প করল। সুজন গুনল, ছেলেটা দশ ঢোক জল খেল। অন্তরা বলল - কাল একটা গ্লাস আনবি। আমি দশবারপাম্প করে জল তুলব। কত গ্লাস জল হয় দেখব। তুই দশ ঢোক জল খাবি। কত গ্লাস জল হয় দেখব। বোঝা যাবে, ওভাবে জল খেলে কতটা জল নষ্ট হয়!

স্কুলে ওরা সেকথা বলল। স্যার বললেন — বেশ তো। ওইভাবে তোমরাও মাপবে।

মেপে আর হিসেব করে লেখো

টিউবওয়েল থেকে জল পান করার সময় কতটা জল নষ্ট হয় তা নিয়ে মেপে লেখো:

দশবার পাম্প করে কত গ্লাস জল উঠেছে	কত গ্লাস জল দশ ঢোকে পান করো	কতটা জল নষ্ট হয়েছে	তোলা জলের কত ভগ্নাংশ জল নষ্ট হয়েছে

বৃষ্টির জল ধরো

সুজন বলল— স্যার, কল থেকে জল পড়ে জলটা কোথায় যায়? সব কি নষ্ট হয়?

কেয়া বলল— কলতলাটা দেখিসনি? চাতালটার পাশেই পড়ে। ভিজে যায়। পিছল হয়।

—ওই জলের বেশিটাই বাষ্প হয়ে যায়। কিছুটা মাটিকে নরম রাখে।

— বর্ষাকালে বৃষ্টির জলও এভাবে নষ্ট হয়।

সুজন বলল— বৃষ্টির জল ঘরের নানা কাজে লাগানো যায় না?

— তাহলে তো খুব ভালো হয়।

— টিনের চাল থেকে যে জল পড়ে তা ব্যবহার করা যায়।

— নিশ্চয়ই।

— বৃষ্টি শুরুর পর প্রথম দিকে খানিকটা জলে নোংরা থাকে।

— শুরুতে বৃষ্টির জলে খুব সামান্য অ্যাসিড থাকে। সেটা ধরবে না। খানিক পর থেকে জল নেবে।

সাবিনা বলল— ছাদের পাইপ থেকে যে জল পড়ে সেটা নেওয়া যাবে?

— সেটাও অনেক কাজের উপযোগী। পুকুরের জলের চেয়ে অনেক ভালো। নোংরা দেখলে কাপড় বা গামছা দু-তিন ভাঁজ করে তা দিয়ে জল ছেঁকে নেবে। তবে এসব জল রান্নায় বা পানের জন্য ব্যবহার কোরো না। তবে গাছের গোড়ায় ঐ জল দেওয়া যায়। অনেক জায়গায় বহুতল বাড়িতে বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থাও আছে।

খোঁজ করে লেখো

খোঁজ করে দেখো কারা বর্ষাকালে নানাভাবে জল ধরেন, কে, কীভাবে জল ধরেন, তা নিয়ে কী করেন, জেনে লেখো:

যাঁরা বৃষ্টির জল ধরেন তাঁদের নাম	কতটা জল ধরে রাখেন	কীভাবে জল ধরেন	বৃষ্টির জল দিয়ে কী করেন

জল নষ্টের হিসেবনিকেশ

সাবিনা ঠিক করল, একদিনে একটা ট্যাপকল থেকে কতটা জল পড়ে তা মাপবে। বাড়ি পৌঁছে ও ট্যাপকলটা খুলে বালতি ভরল। এক মিনিটে ভরে গেল বালতি। এবার হিসেব করতে বসল। হিসেব করে বুঝল রোজ প্রায় পাঁচশো বালতি জল পড়ে।

স্কুলে গিয়ে স্যারকে বলল সাবিনা। স্যার বললেন— মোট কত লিটার হবে? তোমার বালতিতে কত লিটার জল ধরে?

সাবিনা আগেই একদিন মেপে দেখেছে। বালতিতে ছয় বোতল জল ধরে। এক লিটারের বোতল। তাই বলল—ছ-লিটার।

দীপু বলল— একদিন দেখলে হয়। লোকে কত সময় জল নিচ্ছে। কতটা জল নষ্ট হচ্ছে।

স্যার বললেন— দল করে কাজ করলে সেটা করাই যায়।

সাবিনা ভাবল, আমিও তো বেসিনের কল খুলে মুখ ধুই। আমিও কি জল নষ্ট করি? স্যারকে সেকথা বলতেই স্যার বললেন— অনেকেই জল নষ্ট করেন। কিন্তু খেয়ালই করেন না। জল নষ্ট করলে পরে পানীয় জলও পাওয়া যাবে না।

ট্যাপে জল থাকে ছ-টা থেকে ন-টা। এগারোটা থেকে একটা। চারটে থেকে সাতটা। মোট আট ঘণ্টা।

এক মিনিটে এক বালতি জল।

ষাট মিনিটে ষাট বালতি জল।

৮ঘণ্টায় (৬০ × ৮ =) ৪৮০বালতি জল।

বলাবলি করে লেখো

কী কাজে কতটা জল খরচ করো তার মোটামুটি একটা মাপ বোঝার চেষ্টা করো। কী কাজ কীভাবে কম জল দিয়ে করা যেত তা ভাবো। আলোচনা করো। তারপর লেখো:

জল ব্যবহার করে করা কাজ	কীভাবে জল ব্যবহার করো	কীভাবে কাজটা করলে জল খরচ কমবে

কত গভীরের জল

বিশু একবার রাজুমামার বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে টিউবওয়েল খুব কম। গ্রামে একটা মাত্র টিউবওয়েল। খুব লম্বা হাতল। আর কিছু কুয়ো আছে। তাও অনেক দূরে দূরে। গ্রামের মানুষ কুয়োর জলও খান। সকালবেলা মা-দিদিরা দলবেঁধে

হাঁড়ি কলশি নিয়ে জল আনতে যান। কুয়ো বা টিউবওয়েলে। অনেকে আধঘণ্টাও হাঁটেন।

স্কুলে একথা বলল বিশু,শুনে সবাই অবাক। স্বপ্না বলল— অন্য সব কাজের জল কোথায় পান ?

—পুকুরের জল দিয়েই সব কাজ করেন। তাও বেশি জল পান না। গ্রামে একটা বড়ো পুকুর আছে। সেখানেই স্নান করেন।

—সেও তো বাড়ি থেকে অনেক দূর ! সেখান থেকেই সব কাজের জল বয়ে আনেন ?

— তাছাড়া আর উপায় কি ?

সাবিনা বলল — সারাদিনে একজন নিজের ব্যবহারের জন্য এক কি দুই বালতির বেশি জল পান না ?

আকাশ বলল — আমার মাসির বাড়ির কাছে এক পাইপের টিউবওয়েল আছে। কুড়ি ফুটের একটা পাইপ, নীচে ফিল্টার, উপরে কল। ওঁরা সব কাজই ওই টিউবওয়েলের জল দিয়ে করেন।

তিয়ান বলল — ওই জল খাওয়া ঠিক নয়।

স্যার বললেন — ঠিক বলেছ। মাটির নীচের জল হলেই তা

পানের যোগ্য হবে, এমন নয়। ওই স্তরে উপর থেকে চুঁইয়ে জল যায়। পুকুরের জলও চুঁইয়ে যায়।

ভেবে, মেপে, খবর নিয়ে লেখো

১। চান করা বাদে তুমি দৈনিক কত লিটার করে জল ব্যবহার করো? তা ভেবে বা মেপে লেখো:

পানের জন্য	মুখ ধোয়ায়				বাথরুমে ও অন্য কাজে
	সকালে	দুপুরে খাওয়ার পর	রাতে খাওয়ার পর	অন্য সময়	

২। তুমি যে জল পান করো তা কত গভীর স্তরের জল? খবর নিয়ে লেখো। যে জলের ট্যাঙ্ক থেকে পাঠানো জল পান করো, ওই জলের ট্যাঙ্ক কতদিন অন্তর পরিষ্কার করা হয় সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে লেখো:

তুমি কত গভীরের জল পান করো	যে জলের ট্যাঙ্ক থেকে পাঠানো জল পান করো তা কতদিন অন্তর পরিষ্কার করা হয়

মাঝখানে কেউ যায় না

দীপুদের বাড়ির উত্তরদিকে মাঠ। ওদিকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে একটা জলাভূমি। কখনও সেখানকার জল শুকোয় না। আবার গভীর জলও হয় না। ওখানকার মাটিও চাষজমির মতো নয়। অনেক গাছ আছে। শোলা, পানা, হলকলমি, ঘাস, লতাপাতা ভরতি। কলমি শাক, ঢেঁকিশাক, কচু গাছও আছে। অনেকে ওসব তুলে হাটে বেচেন।

অনেক বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, চিল, শামুকখোল, ডাহুক, কাদাখোঁচা দেখা যায়। বড়ো বড়ো সাপও নাকি আছে। সন্ধ্যার দিকে শেয়াল, বেজি, ভোঁদড় দেখা যায়। আগে নাকি কুমিরও থাকত। মাঝখানে কেউ যায় না। অনেকে ধারে-ধারে মাছ ধরতে যায়। শোল,শাল, মাগুর,শিঙি, কই, পাঁকাল, বোয়াল মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া পায়। সুদামদা মাছ ধরতে গিয়ে মস্ত একটা কচ্ছপ পেয়েছিলেন। সেটা আবার জলেই ছেড়ে দিলেন। কচ্ছপ ধরা যে বেআইনি !

পাড়ার লোকরা জলাটাকে বলে কুবিরদহ। চারপাশ ঘুরে আসতে গেলে আধ ঘন্টা লাগবেই।

ওটা কি জলাশয় ? — জানতে চাইল দীপু।

স্যার বললেন— হ্যাঁ, তবে জলাভূমি বলাই ভালো। আসলে ওটা হয়তো বুজে যাওয়া বিশাল দিঘি কিংবা বাঁওড়। আবার মরা নদী বা বিলও হতে পারে। ওর তলার কোনো জায়গার সঙ্গে হয়তো মাটির নীচের জলের যোগ আছে। তাই কিছুতেই জল শুকোয় না। আবার অতিবৃষ্টির জল মাটির নীচেও চলে যায়।

অনন্ত বলল— ওখানে শীতকালে অনেক নতুন ধরনের পাখি আসে। কালো-সাদা ছোপওয়ালা মাছরাঙাও দেখেছি। কাছে পিঠে ওইরকম জায়গা আর নেই।

—খুব কাছে হয়তো নেই। কিন্তু এইরকম জলাভূমি অনেক আছে। এই ব্লকেই হয়তো দশ-কুড়িটা। গোটা রাজ্যের কথা বললে হাজার কয়েক হয়ে যাবে। তার মধ্যে চারটের নাম করতেই হবে। সেগুলো খুব বড়ো। নানা কারণে খুব বিখ্যাত। দূর থেকেও লোকে দেখতে যায়।

— সেগুলো কোথায়?

কোনটা কোথায় আর কী নাম তা বোর্ডে লিখে দিলেন স্যার। সবাই পড়ল।

দীপু বলল— একটা জলাভূমি, একটা বাঁধ, একটা ঝিল, একটা বিল?

— এক-এক জায়গায় এক-একরকম নাম। তোমাদেরটা দহ। আবার কোথাও পটস, কোথাও তাল। কোথাও চাউরস কোথাও মোনস, কোথাও ডাল।

— নাম আলাদা হলেও আসলে জলাভূমিগুলো কি একইরকম?

— অনেকটা। খুব বড়ো হলে তাতে নৌকা চলে। মাঝে কিছু উঁচু জায়গাও থাকে। নদীর চড়া ধরনের। জীবজন্তু অনেক বেশি থাকে।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি	পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ
হাওড়ার সাঁতরাগাছি ঝিল	কোচবিহারের রসিক বিল

কলকাতার ঢাল পূর্বদিকে

আবির আর ফতেমা পূর্ব-কলকাতার জলাভূমি দেখেছে। ওদের দুজনের বাবা আর বুবলাকাকু ওখানে মাছ চাষ করেন। নোংরা জলে মাছ চাষ হয়। কাকু বলেন— নোংরা জলে মাছ চাষের এত বড়ো জায়গা আর নেই। সারা কলকাতার নোংরা এখানে জমে। তাই চারপাশটা ভরাট হয়ে আসছে। ভরাট হয়ে বাড়িঘর হচ্ছে। রাস্তা হচ্ছে। ওইসব রাস্তা দিয়েই ওরা একদিন চারপাশ ঘুরেছে। কাকুর মোটরসাইকেলে করে । কী বিরাট জায়গা! এক ঘন্টারও বেশি সময় লেগেছিল মনে হয়।

স্যারকে এসব বলল ওরা। স্যার বললেন— খুব ভালো কথা। এর এখনকার অবস্থা সবাইকে তোমরাই বলবে। আমি আগের কিছু কথা বলি।

তারপর স্যার কিছুটা বললেন। কিছুটা বোর্ডে লিখলেন।

— তিনশো বছর আগে কলকাতার নোংরা গঙ্গায় ফেলা হতো। তাতে গঙ্গা ভরতে লাগল। বন্যার ভয় বাড়ল। মাপজোখ করে দেখা গেল কলকাতার ঢাল পূর্বদিকে। দেড়শো বছর আগে ঠিক হলো শহরের নোংরা পূর্বদিকে ফেলা হবে। আর নোংরা জল পাম্প করে বিদ্যাধরী নদী

১৮৫৭ সাল (উইলিয়াম ক্লার্কের পরিকল্পনা):কলকাতার আবর্জনা ও নোংরা জল পূর্বে পাঠানো শুরু।

১৮৬০ সাল: আবর্জনা-মেশা নোংরা জলে মাছ চাষ শুরু।

১৮৭২ সাল: মাছের ঘাট তৈরি।

১৯১৮ সাল: পাকাপাকিভাবে মাছচাষ শুরু।

১৯২৯ সাল: বাণিজ্যিকভাবে মাছচাষ শুরু।

দিয়ে পাঠানো হবে। যাবে বঙ্গোপসাগরে। সেই মতো কাজ শুরু হলো। এতে বিদ্যাধরীর স্রোত কমে গেল। এই অংশে নদীটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়া বদ্ধজলা হয়ে গেল। প্রথম প্রথম অল্প মাছ চাষ শুরু হল। তারপর একসময় মাছ চাষের বিরাট জায়গা হয়ে গেল এখানটা।

সোনাই বলল— ওখানে মাছ ছাড়া আর কোনো জীবজন্তু নেই?

— আছে। শামুক, সাপ, পোকা, পাখি, শিয়াল, জলার বেজি আছে। অনেক সময় ভাম-বিড়াল, কাদার কচ্ছপও দেখা যায়। নৌকা করে জলে ঘোরার সময় নানারকম জল-পাখিও চোখে পড়ে।

ভৌত পরিবেশ

তোমরা কাছের একটা জলাভূমি ঘুরে আসবে। দেখতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। দেখে এসে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করবে। আগে যারা গিয়েছেন তাঁদের কথা শুনবে। তারপর লিখবে :

জলাভূমির নাম:	দেখতে যাওয়ার তারিখ:
ঠিকানা:	
দৈর্ঘ্য: প্রস্থ:	আর কী কী কাজে ব্যবহার হয়:
জল কোথা থেকে আসে:	পাশে কী কী গাছ আছে:
বর্ষাকালে কত গভীর জল হয়:	কী কী পাখি দেখা গেল:
কতদিন জল জমা থাকে/ কমে গেলে কতটা জল থাকে:	কী কী পশু দেখা গেল:
জলের রং কেমন:	
জলে কী গাছ আছে:	মাঝে চড়া/ ঢিবি আছে কিনা:
জল কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে:	অন্যান্য বিষয়:

উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নিয়ে জীবজগৎ

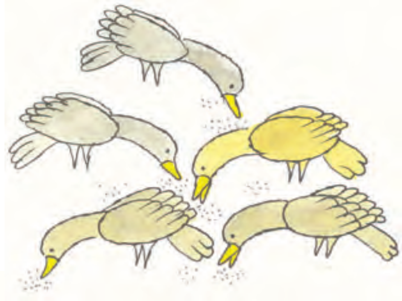

ভোরবেলা দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল পিকু। চারদিকে সবুজ গাছপালা। নীল আকাশে সূর্য।

দাদু বললেন— সূর্যের আলো, মাটি, জল, বাতাস। এরই মাঝে গড়ে উঠেছে বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ। অনেক বছর আগে। পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে প্রাণীজগতের। পোকামাকড়, অনেকরকম পাখি, ছাগল, গোরু, ভেড়া, খরগোশ, হরিণ। ঘাস, পাতা, গাছ, ফুল, ফল খেয়ে তারা বেঁচে থাকে। আবার বাঘ, সিংহ, নেকড়ে তাদের খেয়ে বাঁচে।

এই পর্যন্ত শুনেই পিকু বলল— মানুষ এসেছে অনেক পরে, তাই না? মানুষ তো সবই খায়। গাছের মূল থেকে ফুল, ফল, বীজ। হরেকরকম মাছ। নানা প্রাণীর মাংস, দুধ। মৌমাছির তৈরি করা মধু।

দাদু বললেন--- মানুষের দরকার সবাইকে। গোটা জীবজগৎ টিকে না থাকলে মানুষের সবচেয়ে অসুবিধা। স্কুলে সব শুনে দিদিমণি বললেন— উদ্ভিদ আর প্রাণীদের মধ্যে কে কার উপর নির্ভর করে তা কি ভেবেছ?

বলাবলি করে লেখো

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খাদ্য বিষয়ে আলোচনা করো।

তারপর লেখো :

গাছ কী কী দিয়ে খাদ্য তৈরি করে	কোন প্রাণীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খায়	তৃণভোজীদের কারা খায়	কোন গাছ কোন প্রাণীকে খাদ্য জোগায়

বুনো থেকে পোষা হলো

নাসরিনরা সাঁতরাগাছির ঝিলে পাখি দেখতে গিয়েছিল।

শীতের সময় পাখিগুলো আসে। এই পাখিরা যেখানে থাকে সেখানে আরও বেশি শীত। তাই সেখান থেকে চলে আসে। কম শীতের দেশে দু-মাস কাটিয়ে আবার ফিরে

যায়। পাখিগুলো দেখে নাসরিন অবাক। বলল— এত হাঁসের মতো দেখতে! কতকগুলো তো আমাদের পোষা হাঁসের মতো।

দিদিমণি বললেন— হাঁসই তো, তবে এরা বুনো হাঁস। বুনো হাঁস পোষ মেনেই তো পোষা হাঁস হয়েছে।

নাসরিন মানতে চাইল না। বলল— আমাদের পোষা হাঁসগুলো তো পোষা হাঁসের ডিম ফুটিয়েই হয়েছে।

দিদিমণি বললেন— ঠিকই বলেছ। হাঁস পুষলে ডিম পাওয়া যাবে। তাই ভেবে মানুষ বুনো হাঁসকে পোষ মানাতে চেয়েছিল। সহজে খাবারদাবার পেয়ে একদল বুনো হাঁস পোষ মেনেছিল।

রবিন বলল— বুঝেছি। সেগুলো পোষা হাঁস হলো। আর বুনো হাঁসের অন্য দলগুলো বুনোই রয়ে গেল।

সমীর বলল— দিদি, মোরগের বেলায়ও এমন হয়েছে। জলদাপাড়ার বনে লাল বনমোরগ দেখেছি। সেটা অনেকটা অমিনাদের মোরগটার মতো দেখতে।

—ঠিক বলেছ। জলদাপাড়ার জঙ্গলে বড়ো বড়ো কালো গোরুর মতো জন্তুও আছে। নাম ‘গৌর’। অনেকে বলেন ভারতীয় বাইসন। আমাদের দেশি গোরুরা আগে ওদের মতোই ছিল।

নাসরিন বলল— তার মানে, সব পালিত পশুই একসময় বুনো ছিল। কেউ কেউ এখনও বুনো রয়ে গেছে।

— তবে পশু-পাখি পোষ মানানোর একটা ইতিহাস আছে। সব পশু-পাখি এক সময়ে পোষ মানেনি। কুকুর নাকি প্রথম পোষ মেনেছিল। তারপর মানুষ দেখল গোরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া এদের পোষ মানালে অনেক সুবিধা। চাষের

কাজে, যানবাহন হিসাবে তাদের ব্যবহার হতে পারে। তবে আজকাল কিছু কিছু মাছ, মৌমাছিদেরও মানুষ পোষ মানাচ্ছে।

বলাবলি করে লেখো

কোন কোন পশু ও পাখি পোষ মেনে পালিত পশু-পাখি হয়েছে? তাদের থেকে কী পাওয়া যায় তা আলোচনা করে লেখো:

পালিত পশুর নাম	তাদের থেকে কী কী পাওয়া যায়	পালিত পাখির নাম	তাদের থেকে কী কী পাওয়া যায়

কে বন্য কে পোষা

স্কুল থেকে ফেরার পথে 'পালিত' শব্দটা নিয়ে কথা শুরু হলো। তপন বলল— যে পশুদের মানুষ থাকার জায়গা দেয়, খেতে দেয়, তারাই পালিত পশু। সেরকম পালিত পাখিও হয়।

সোনাই বলল— মানুষ তাদের শিকারি প্রাণীর থেকে বাঁচায়। অসুখ হলে চিকিৎসা করায়।

তহমিনা বলল— মানুষ নিজেদের দরকারে ওদের পালন করে। গোরু দুধ দেয়। হাঁস-মুরগি ডিম-মাংস দেয়।

— তা ঠিক। তবে ভালোবাসাও আছে। টিয়ার কথা ধরো। টিয়ার কি ডিম-মাংস কিছু খাই? তাও তো আমরা পুষি!

পরদিন স্কুলে একথা উঠল। দিদিমণি বললেন— আগে বলো, টিয়া কি পালিত? হাঁস আর টিয়া কি একইভাবে থাকে?

সোনাই বলল— টিয়াকে শুধু ভালোবেসে পুষি আমরা। দেখতে সুন্দর তো! তাই হয়তো টিয়ার বেশি আদর।

— বেশ। ধরো, তুমি হাঁসকে সন্ধ্যাবেলা ডাক দাওনি। ওরা কি জল ছেড়ে ঘরে আসবে?

— সে তো মাঝে মাঝে হয়। জল থেকে ডাকতে যেতে দেরি হয়। ওরা নিজেরাই চলে আসে।

— টিয়ার বেলায়? সকালবেলা হাঁসদের ছেড়ে দিচ্ছ। তেমনি, টিয়াকেও খাঁচা থেকে ছেড়ে দাও। সে সন্ধ্যায় ফিরে আসে কিনা দেখো।

সোনাই কিছু বলার আগেই রফিক বলল— না দিদি। ফিরবে না। চাচা একটা টিয়া পুষেছিল। একদিন খেতে দিয়ে খাঁচার দরজা লাগায়নি। উড়ে গেছে। আর ফেরেনি।

— আসলে ও নিজের ইচ্ছায় খাঁচায় ছিল না। ও পোষ মানতে চায় না। বন্য হয়েই থাকতে চায়।

তপন বলল— কিন্তু, টিয়া কী করে বন্য হবে? কাউকে কামড়ায় না। কোনো ক্ষতি করে না।

— কোনো বন্যপশুই অকারণে ক্ষতি করে না। নিজেদের খাবার জোগাড় করে। বাধা পেলে সাধ্যমতো লড়াই করে। ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে থাকার জায়গা চায়। তা কেড়ে নিলে রাগ করে। পারলে লড়াই করে। কামড়ে দেয়। তাদের ক্ষতি করতে গেলে তবেই আক্রমণ করে।

— তাহলে কোনো পাখিই পোষা যাবে না? কারো যদি পাখি ভালো লাগে!

— তুমি পাখিকে খেতে দেবে। খাবার দেবে। গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেবে। তার যখন খুশি সে খেয়ে যাবে। তখন তাকে দেখবে।

সোনাই বলল— টিয়া যদি বন্য হয় তাহলে আমরা অনেক বন্যপ্রাণী দেখি।

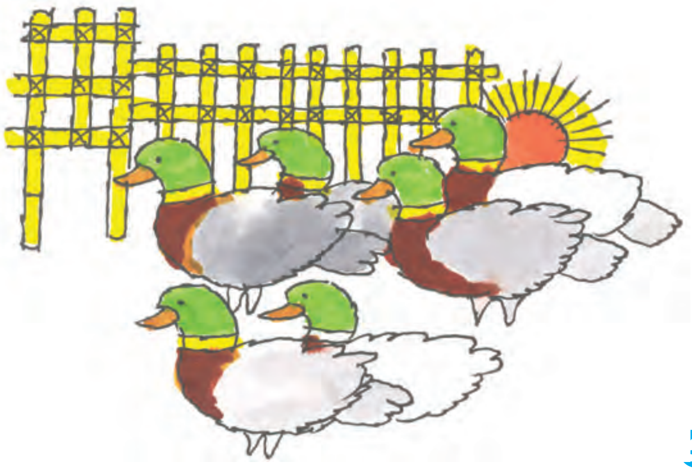

— ঠিকই। মাঝে মাঝেই দেখো। হাতি, বাঘ, ভালুক এরা তো বন্য প্রাণী বটেই। জঙ্গলে যারা থাকে তারাই শুধু বন্য তা নয়। সাপ, বেজি, কাক, চড়াই – সবই বন্য।

বলাবলি করে লেখো

যে সব বন্য পশুপাখি দেখতে পাও তাদের নাম ও পরিবেশে তাদের ভূমিকা বিষয়ে লেখো:

প্রায়ই দেখা বন্য পশুর নাম	পরিবেশে তাদের ভূমিকা কী	প্রায়ই দেখা বন্য পাখির নাম	পরিবেশে তাদের ভূমিকা

বাড়ির কাছেই এত উদ্ভিদ

নানাদিকে বন্য পশুপাখি খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই! সন্ধ্যাবেলা সত্য পুকুর পাড়ের কাছে গিয়ে দেখল অনেক ঝোপ। তার ভিতর কী একটা জন্তু ছুটে পালাল।

তখন ঝোপের গাছগুলোকেই সত্য দেখল অনেকক্ষণ ধরে। চার রকমের গাছ। একটা তো ফার্ন। ঠাকুমা সেটাকে বলেন ঢেঁকি শাক। খেতে বেশ ভালো। বাকি তিনটে অচেনা। একটায় ফুলও ফুটেছে। ভাবল, একটা করে ডগা ছিঁড়ে নিয়ে যাব! জানার জন্য ছিঁড়লে দিদিমণি কি আর রাগ করবেন?

স্কুলে গিয়ে দিদিকে দেখাতে হলো না। পাতাগুলো দেখে স্বপ্নাই সব বলে দিল। হেলেঞ্চা, কুলেখাড়া আর ব্রাহ্মী। সব শুনে দিদিমণি বললেন— উদ্ভিদ চেনাটাও তো মজার ব্যাপার। যত পারো গাছ দেখো।

সত্য বলল— গাছ চেনাটাই সহজ। গাছ তো আর ছুটে পালাতে পারবে না!

— হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পারবে। কোনটা দেখলে তা খাতায় লিখে রাখবে।

দেখেশুনে লেখো

১। চারটে গাছ সম্পর্কে লেখো, ছবি আঁকো :

ঢেঁকি শাক	হেলেঞ্চা	কুলেখাড়া	ব্রাহ্মী

২। একটা গাছের ছবি আঁকো। তারপাতা, ডাল, গুঁড়ি চিহ্নিত করো। সেগুলো থেকে কী কী উপকার পাওয়া যায় লেখো :

গাছের ছবি (পাতা, ডাল, গুঁড়ি)	আমরা তার থেকে কী উপকার পাই

ঘরের কাছে কত প্রাণী

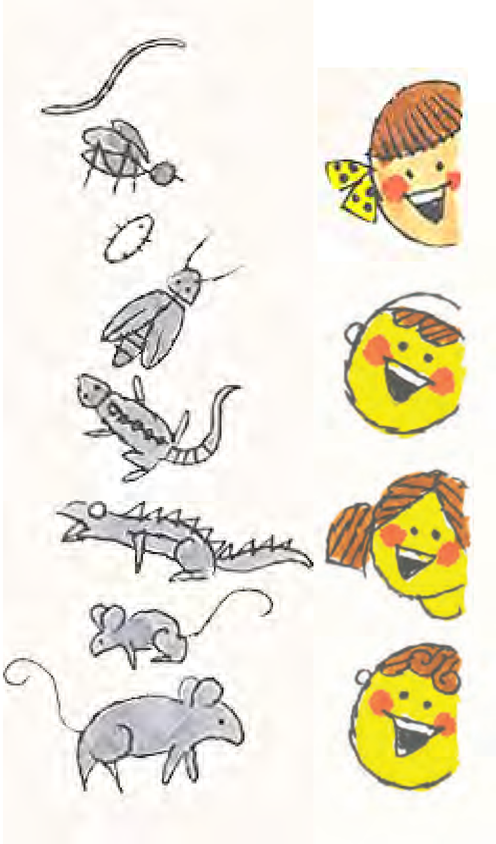

উদ্ভিদ আর প্রাণী। দুইই দেখছে সবাই। খাতায় উদ্ভিদের নাম লিখছে। পশুপাখিদের নাম লিখছে। তাদের ছবি আঁকছে। কোন তারিখে কোনটা দেখেছে তাও লিখে রাখছে। রুমা একদিন একটা প্রাণী দেখল। মাপে বড়ো হুলো-বেড়ালের মতো। রং কালো, মুখটা কুকুরের মতো সরু। লেজটা লম্বা আর লোমশ। পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে জানতে চাইল, ওটার নাম কী?

দিদিমণি বললেন— ওটা গন্ধগোকুল। ভাম-বেড়ালও বলে।

আমিনা বলল— ওটা তো বন্যপশু। কিন্তু পিঁপড়ে? আমরা পুষি না, তবু তারা ঘরবাড়িতেই থাকে।

— কিন্তু ওরা পোষা নয়, পোষ মানেনি। ওরাও বন্য।

সুদাম বলল—কেন্নো, মশা, উই, আরশোলাও বাড়িতে

থাকতে চায়। তাড়ালেও আবার আসে। তবু ওরা বন্য?

রফিক বলল— টিকটিকি, গিরগিটি, মাকড়সা এরাও ওই রকম।

মথন বলল— গিরগিটি, মাকড়সা ঝোপঝাড়েও থাকে।

অলিভিয়া বলল— ইঁদুর-ছুঁচোরাও বুনো। ওরা বাড়িতে আসে খাবারের খোঁজে। মানুষ দেখলেই পালায়।

স্বপ্না বলল— টিকটিকিও পালায়। তাই টিকটিকিও বুনো, পোষা নয়।

— তোমরা কত বন্যপ্রাণী চেনো! শুনেই আমার আনন্দ হচ্ছে।

দয়াল বলল— দিদি, আমি দশ-বারো রকম সাপও চিনি।

— সে তো খুব ভালো কথা। তুমি নানারকম সাপের ছবি আঁকবে। সবাইকে চেনাবে। ওরা লিখবে কোনটার কী নাম।

গণেশ বলল— ওরে বাবা! আমি সাপ দেখলেই ছুট দেব। শুনেছি সাপের ছোবল খেলেই মৃত্যু।

দয়াল বলল— মোটেই না। বেশিরভাগ সাপের কামড়ে মানুষ মরে না। তাছাড়া অকারণে সাপেরা কামড়ায়ও না।

আমরা ওদের ভয় পেয়ে মারি। ওরাও আমাদের ভয় পেয়ে কামড়ায়।

— সেটা ঠিক। তবে সাপও বুনো। কোনো সাপই পোষা নয়।

বলাবলি করে লেখো

বাড়ির পোষা প্রাণী, বাড়িতে আসা বুনো-প্রাণী আর ঝোপ-জঙ্গলের বুনো-প্রাণী এই তিন ভাগে চেনা প্রাণীদের ভাগ করে নাম লেখো:

বাড়ির পোষা প্রাণী	বাড়িতে আসা বুনো-প্রাণী	ঝোপজঙ্গলের বুনো-প্রাণী

শিখব সবাই মিলে, চিনব সবাইকে

অনেকেই অনেক গাছ চেনে না। প্রাণী চেনে না। তাই নাম লিখতে পারে না। বর্ণনা লিখে আনে। স্বপ্না, দয়াল, ফিরোজ এবং আরো কেউ কেউ অনেক নাম বলে দেয়। দিদিমণিও বলে দেন। যে যতটা পারে দেখে আসে। বলে, লিখে আনে।

রিনা বলল— প্রাণীরা নানারকমের। কেন্নোর পা গুনে শেষ করা যাবে না। কেঁচোর আবার পা নেই।

মিতা বলল--- সাপের গায়ে লোম নেই। ওদের গা চকচক করে।

— সাপের গা ভরতি আঁশ।

রিনা বলল— শুঁয়োপোকার

গা-ভরতি শুঁয়ো। গায়ে লাগলে খুব চুলকানি হয়। ওদের দেখতেও বিচ্ছিরি।

মিতা বলল— প্রজাপতির গায়ে দুটো ডানা। দেখতে কী সুন্দর!

— ওই শুঁয়োপোকাগুলোই পরে প্রজাপতি হয়।

মিতা বিশ্বাস করল না। বলল—তা আবার হয় নাকি? শুঁয়োগুলো যাবে কোথায়?

দিদিমণি বললেন — রিনা কিন্তু ঠিকই বলেছে। অনেক দিন ধরে শুঁয়োপোকা লক্ষ করলে বুঝতে পারবে।

আসিফ বলল— আমরা শুধু ডাঙার প্রাণীদের কথা বলছি। জলের মাছ ব্যাংগুলোও তো আছে।।

— ঠিকই। জলে আছে হরেকরকম মাছ-ব্যাং। আরও অনেক প্রাণী। তোমরা জলের প্রাণীদেরও দেখো। তাদের শরীরেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। তাদের স্বভাব নিয়ে আলোচনা করো।

বলাবলি করে লেখো

নতুন করে যেসব প্রাণীদের চিনেছ তাদের কথা লেখো:

প্রাণীদের নাম	কী খায়	কোথায় থাকে	অন্য বৈশিষ্ট্য (ধীরে চলে/ দ্রুত চলে/ নিশাচর/ শিকারি/ নিরীহ ইত্যাদি)

কে মেরুদণ্ডী, কে অমেরুদণ্ডী

দিদি আর জেঠিমা দীনুদের 'হোছনা পুকুর' থেকে জল ছেঁকে মাছ ধরছেন। দীনু জলের প্রাণী দেখতে

গেল। মৌরলা, পুঁটি আর ট্যাংরা মাছ উঠল। তাছাড়া ছোটো চিংড়ি, একটা গলদা চিংড়িও উঠল। গেঁড়ি শামুক, ছোটো-বড়ো আরও দু-তিনরকম শামুক উঠল। কয়েকটা ব্যাঙাচি। আরও কত রকমের পোকা।

দীনু বলল— জেঠিমা, জলে এতরকম পোকা থাকে? এগুলোর কী নাম?

জেঠিমা অবাক। বললেন— জলের পোকার নাম? সবার নাম থাকে নাকি? আর, এতরকম বলছিস? পরশুদিন পুকুরে বড়ো জাল ফেলা হবে। সেদিন দেখবে আরও কতরকম পোকা। জলের পোকার কি আর শেষ আছে?

স্কুলে এসে দীনু এসব কথা বলল।

মিতা বলল - রুই মাছের গা আঁশে ঢাকা। কিন্তু ট্যাংরার আঁশ নেই।

রিনা বলল— আবার ট্যাংরার কাঁটা আছে। রুইয়ের কাঁটা নেই। আছে পাখনা।

— ট্যাংরার কাঁটাগুলো এক ধরনের পাখনাই। রুইয়ের সাতটা পাখনা। কাঁটা আর পাখনা মিলে ট্যাংরারও সাতটাই।

পঙ্কজ বলল—রুই মাছের ভিতরে ট্যাংরার চেয়ে কাঁটা বেশি।

রঞ্জন বলল--- মাছের ভিতরের কাঁটা কি আমাদের হাড়ের মতো?

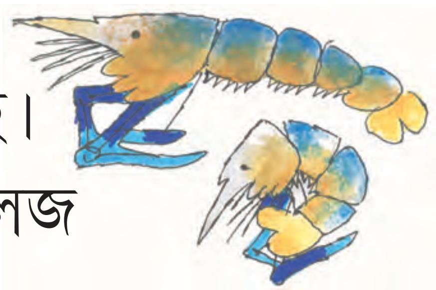

রিনা বলল - তা তো বটেই। দুটোরই মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত একটা কাঁটা আছে।

— ওটাকে বলে মেরুদণ্ড। যাদের ওইরকম একটা হাড় আছে তাদের বলে মেরুদণ্ডী প্রাণী।

— আমাদেরও তো আছে। তাহলে মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী?

— নিশ্চয়ই। আরও অনেক প্রাণীই মেরুদণ্ডী। মেরুদণ্ড নেই, এমন প্রাণীও আছে।

— চিংড়ি মাছেরই তো কোনো কাঁটা নেই।

— ঠিক, চিংড়ির কাঁটা নেই। চিংড়ি অবশ্য মাছ নয়। চিংড়ি একটা অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

— অন্য পোকাগুলোরও মেরুদণ্ড নেই। শামুকের মেরুদণ্ড নেই। কেঁচো, প্রজাপতিরও মেরুদণ্ড নেই।

বলাবলি করে লেখো

যেসব মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেখেছ তাদের বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম	অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম	দুই রকম প্রাণীর মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যায়

চেনা গাছের আচার-আচরণ

ইতুরা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে। বারান্দায় টবে কতগুলো গাছ লাগিয়েছে। ছুটিতে দেশের বাড়ি যাবে। গাছগুলো রোদে শুকিয়ে যেতে পারে! তাই ইতু টবগুলো ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

ফিরে এসে দেখল সব টবের গাছই জানালার দিকে হেলে পড়েছে। ইতু ভালো করে দেখল। জানালার একটা জায়গায় ভাঙা আছে। সেখান দিয়ে দুপুর থেকে রোদ ঢোকে।

স্বপনদের করলা গাছগুলোয় দুই-তিনটে করে পাতা হয়েছে। ওর বাবা চেরা বাঁশ আর কঞ্চি দিয়ে মাচা করে

দিলেন। স্বপন ভাবল, এ তো লতানো গাছ! মাচায় উঠবে কী করে? তাই ও রোজ গাছটাকে দেখতে লাগল। কয়েকদিন পরে গাছটার গা থেকে সবুজ সুতোর মতো বেরোলো। কয়েকদিন পরে সেটা একটা বাঁশকে জড়িয়ে ধরল। গাছটা যত বড়ো হতে থাকল ততই গা থেকে ওইরকম সবুজ সুতো বেরোতে থাকল। বাঁশটাকে জড়িয়ে ধরে গাছটা মাচায় উঠতে লাগল।

স্বপন স্কুলে বলল ব্যাপারটা। সোনাই বলল--- তুই এতদিনে দেখলি! লাউ-কুমড়ো লতা ওইভাবে মাচায় ওঠে।

দিদিমণি বললেন— সুতোর মতো ওটাও একটা পাতা। ওকে বলে আকর্ষ। অনেক লতানো গাছের আকর্ষ হয়।

স্বপন বলল— মাচায় ওঠার জন্য আকর্ষ তৈরি করে, তাই না?

—ঠিক বলেছ। লতানো গাছ। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পাশের শক্ত কিছু ধরে দাঁড়াতে চায়। তাই আকর্ষ বের করে।

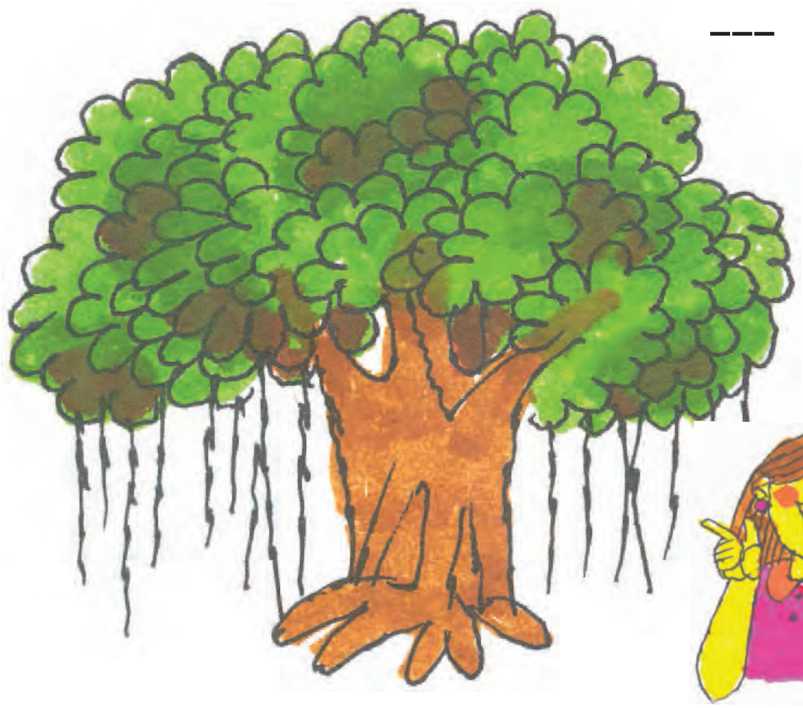

--- লতানো গাছ ছাড়া কোনো গাছ এমন করে না?

— আকর্ষ বের করে না। তবে দরকার মতো অন্য উপায় নেয়।

নাসরিন বলল— বটগাছ ঝুরি নামায়।

ইতু বলল— বটের চারপাশে ডাল। মোটা ডালগুলো ভারে ভেঙে যেতে পারে। সেগুলোর ভর দেওয়ার কিছু চাই। তাই ঝুরি নামায়, তাই না?

— ঠিক বলেছ। এটা বটগাছের একটা বিশেষ আচরণ।

দেখেশুনে লেখো

আর কোন গাছ এমন বিশেষ আচরণ করে? যে যা দেখেছ, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো:

গাছের নাম	লতানো/ শক্ত গুঁড়ি	বিশেষ আচরণ	কেন ওই আচরণ

খুব চেনা প্রাণীর আচার-আচরণ

সেদিন খুব গুমোট গরম। বারান্দায় বসে পড়ছিল ফতেমা। হঠাৎ দেখল, বারান্দার কোণ ধরে সার বেঁধে পিঁপড়েরা যাচ্ছে। তাদের মুখে ছোটো সাদা পুঁটলি। ফতেমা ভালোভাবে দেখতে গেল। বারান্দার নীচে মাটির গর্ত থেকে সারিবদ্ধ ভাবে পিঁপড়েরা চলেছে। ঘরের

দেয়ালের একটা ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে। মুখে ওই রকম একটা ছোট্ট গোল, সাদা থলি।

ফতেমা ভাবল ওরা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। গরমের জন্য অন্য জায়গায় খাবার রাখতে যাচ্ছে? হঠাৎ দেখল নানা আসছে। নানাকে বলল— দেখো, পিঁপড়েরা অন্য জায়গায় খাবার রাখতে যাচ্ছে।

নানা হেসে বললেন— ওদের খাবার নয়। ওরা উঁচু জায়গায় ডিম সরাচ্ছে। আজ বৃষ্টি হতে পারে।

সত্যিই সেদিন বিকালে বৃষ্টি হলো। ফতেমা বুঝল, **বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা পিঁপড়েরা হয়তো বুঝতে পারে। সেইমতো সাবধানও হয়।**

রিঙ্কির দাদু কাকদের রুটির টুকরো দিচ্ছিলেন। একদিন রিঙ্কি দেখল একটা কাক রুটির টুকরোটা খেল না। মুখে করে উড়ে গেল। বসল কলসমদের বাড়ির টালির ছাদে। খানিক এদিক-ওদিক দেখল। তারপর রুটির টুকরোটা ঠোঁট দিয়ে গুঁজে দিল দুটো টালির ফাঁকে।

রিঙ্কি দাদুকে সব দেখাল। দাদু বলল — ও খাবার লুকিয়ে রাখল। পরে খাবে। এখন বোধহয় খিদে নেই।

পরে রিঙ্কি অনেকবার দেখেছে কাক খাবার লুকিয়ে রাখে।

দেয়ালে টিকটিকিকে দেখছিল প্রতীক। টিউবলাইটের পাশে একটা টিকটিকি। কাছাকাছি এলেই পোকা ধরছে। আর একটা টিকটিকি ছোটো। কিছুটা দূরে আছে। হঠাৎ একটা ফড়িং এসে বসল দুজনের মাঝখানেই। সেটাকে ধরতে গেল দুজনই। কিন্তু ফড়িংটা উড়ে গেল। বড়ো টিকটিকিটা পড়ল ছোটোটার ঘাড়ে। তার লেজ কামড়ে ধরল। লেজটা ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া লেজটা লাফাতে লাগল।

তবে সে পালিয়ে গেল। কদিন বাদে প্রতীক দেখল তার লেজের ঘা শুকিয়ে গেছে। তারপর লেজটা বাড়তেও লাগল। প্রতীক বুঝল, টিকটিকির লেজ কেটে গেলে আবার গজায়।

ক্লাসে এসব গল্প বলল তিনজনে। দিদিমণি বললেন— বাঃ! চেনা প্রাণীদের নতুন করে চিনছ তোমরা।

বলাবলি করে লেখো

আর কোন প্রাণীর বিশেষ আচরণ দেখেছ তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

কোন প্রাণী নিয়ে ঘটনা	ঘটনার বিবরণ	সেই প্রাণী সম্পর্কে কী বুঝলে

আধ-চেনা প্রাণীর আচার-আচরণ

ছিপ দিয়ে মাছ ধরেন মিশরকাকু। অনীক আজ সঙ্গে গেল। অনীক একটা ছোটো ছিপে পুঁটি মাছ ধরছে। হঠাৎ একটা জায়গায় জল নড়ে উঠল। কাকু দেখতে গেলেন। ফিরে এসে একটা ছোটো পুঁটি নিলেন। মাঝারি ছিপের

বঁড়শিতে তাকে বেঁধালেন। অনীক বলল— একি! মাছ নষ্ট করছ কেন?

কাকু কিছু বললেন না। ছিপ নিয়ে ফিরে গেলেন আগের জায়গায়। পুঁটিটা জলে ফেলে নাড়াতে লাগলেন। একটু পরেই জলে খুব শব্দ। আধমিনিট পরে কাকুর ছিপে একটা শাল মাছ। ফিরে এসে বললেন— এরা শিকারি মাছ। শোল, শাল, চ্যাং, ল্যাটা। নড়তে থাকা মাছ দেখলেই খাবে।

অনীক স্কুলে এসে সেকথা বলল। দিদিমণি বললেন— মাছ হলো তোমাদের আধা-চেনা প্রাণী। এক একজন একেকটা মাছ বিষয়ে জানো। নিজেরা আলোচনা করলে সবার ধারণা ভালো হবে।

মথন বলল— শুধু মাছ? সাপ, ব্যাং, বাদুড়, কাঁকড়া, প্রজাপতিও আধ-চেনা।

দয়াল বলল— সাপের নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়! নানারকম সাপের কামড়ের দাগ কেমন দেখতে তাই ক-জন জানে?

— এবার সবাই জেনে নেবে। তারপর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য শুনলেই বুঝতে পারবে কোন প্রাণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

বলাবলি করে লেখো

নীচের কোন বৈশিষ্ট্য কোন প্রাণীদের? তাদের বিষয়ে নীচে লেখো আর খাতায় ছবি আঁকো:

প্রাণীর একটা বৈশিষ্ট্য	প্রাণীর নাম	অন্য আচার -আচরণ
খোলশ-ছাড়া প্রাণী		
গর্তে থাকা প্রাণী		
বুকে হেঁটে বেড়ানো প্রাণী		
সুন্দর লেজওলা প্রাণী		

স্থানীয় প্রাণীর হারিয়ে যাওয়া

মিনার কাকুর সঙ্গে অনীক বাজারে গেল। মাছ চিনবে। বাজারে অনেক রুই, কাতলা, বাটা, গ্রাসকার্প আছে। এসব মাছের নাকি চাষ হয়।পুঁটি, মৌরলা, খলসে, বেলে কম। এদের চাষ করা হয় না। শোল, শাল, ল্যাটা, বোয়াল খুব কম। এরা শিকারি মাছ। চাষ করা মাছের ছানাদের খেয়ে নেবে। তাই এদের বিশেষ করে মারা হয়।

অনীক ভাবল, কিছুদিন পরে কি আর এসব মাছ দেখা যাবে? স্কুলে এসে সকলকে সেকথা বলল।

দিদিমণি বললেন— ঠিক ভেবেছ। কিছুদিন পরে এগুলো হয়তো থাকবে না।

দয়াল বলল— ছোটো ডোবা-পুকুরে রুই-কাতলা চাষ হয় না। সেখানে আগে শোল-চ্যাং থাকত। কিন্তু মাঠ থেকে কীটনাশক-ধোয়া জল যাচ্ছে সেখানে। তার ফলে মরে যাচ্ছে মাছেরা।

— শুধু তো মাছ নয়। আরও অনেক জীবজন্তুই কমে

গেছে। শকুনরা মরা জন্তুর মাংস খেত। পরিবেশে দুর্গন্ধ হতো না। এখন গোরুদের ব্যথা কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়। তাই তাদের মাংসেও বিষ।

মথন বলল — শকুনরা সেই মাংস খেয়ে হারিয়ে যাওয়ার মুখে?

— হ্যাঁ। অনেক গাছও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনি ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকলে অনেক রকম গাছ গজায়। কিন্তু সব জায়গা পরিষ্কার করে চাষ হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সর্পগন্ধা, মেহেন্দি, মুক্তোঝুরি — এই সব ঔষধি গাছ। বড়োদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করো গত পঞ্চাশ বছরে জীববৈচিত্র্যে আর অন্য বিষয়ের কী কী পরিবর্তন হয়েছে।

— দিদি, জীববৈচিত্র্য কী?

দিদিমণি বললেন— এই যে আমরা চারপাশে নানা রকম উদ্ভিদ আর প্রাণী দেখি সেটাকে বলে জীববৈচিত্র্য।

বলাবলি করে লেখো

গত পঞ্চাশ বছরে তোমার কাছাকাছি অঞ্চলের পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন বিষয়ে খোঁজ নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

স্থানীয় বিষয়	পঞ্চাশ বছরে কতটা (খুব/সামান্য) বেড়েছে বা কমেছে	তাতে স্থানীয় জীবদের কী সুবিধা/ অসুবিধা হয়েছে
জনসংখ্যা	খুব বেড়েছে	
প্রাণী		
উদ্ভিদ, জলাশয়, কৃষিজমি		
রাস্তা		
বিদ্যুতের খুঁটি		
কারখানা		
যানবাহন		
রাসায়নিক সার ব্যবহার		
কীটনাশক ব্যবহার		
অন্যান্য বিষয়		

জীববৈচিত্র্য বিষয়ে এঁকে আর লিখে তোমার পছন্দমতো একটা পোস্টার তৈরি করো: